ঐীতদাস - ঐীতদাসী

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

।। এক ।।

দেখি, দোতলায় দুজনের বসার সিটে একলা বসে আছে। গায়ে শাদা শাল জড়ানো, ব্যস, আর কিছু মনে নেই। মনে পড়ছে না, ভুলতে পারছি না।

আমি কারো চোখের দিকে আজ পর্যন্ত চাইনি। পরিচিত, অর্ধপরিচিত, অপরিচিত, অনেকের দিকে চেয়ে দেখেছি। কারো কারো ঠোঁট, নিতম্ব, স্তন, কারো বা নগ্ন হাত আমার ভাল লেগেছে। কারো নীরবতা মনে আছে, কারো অভিমান, মনে আছে কোনোহাঁটার ভঙ্গি। একজন গায়িকার গ্রীবা মনে পড়ে। কোনো চোখ মনে পড়ে না।

বাসের হ্যান্ডেল ধরে মায়ার দিকে চেয়েছিলুম। শীতের এত ভোরে আমি আগে কখনোই বেইনি। যখন গঙ্গার ওপর বাস উঠল, মনে হচ্ছিল, গঙ্গার জীবনের ভাসমান শোভা দেখে বাসের মানুষগুলো সকলেই দ্বিত্তিহীন, অতিশয় নম্র ও বিনয়ী হয়ে পড়েছে---৮নং বাসের 'লেডিজ ওনলি' আঁটা সিটে মায়া বসে ছিল হেঁটমুখে, চোখ নামিয়ে -- তাদের চোখ সহসা ছলছলিয়ে ওঠে, কেননা, তটভূমি ত্যাগ করে এই সময় একটি দণ্ডিত জাহাজ, চলে যেতে হবে বলে, কুয়াশার ভিতর দিয়ে তার যাবজ্জীবন নির্বাসনে চলে যায়।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল মায়া, অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে তাকার পর সে ক্রমশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, অবশেষে চোখ তুলে চাইল, চুলে - ঢাকা ডান গালটা একবার ফিরিয়ে - সরিয়ে নিল চকিতে, বাঁ - গালের উড়ন্ত চুল, চাপা কাঁধ ও জাগ্রত কণ্ঠার ফাঁক দিয়ে সেই জাহাজের দূর মাস্তুল দেখা গেল একবার, বাস ব্রিজের উপর উঠছে বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

পরমুহূর্তে সে আবার চোখ তুলে চাইল। ও ! আমূল চমকে উঠল মায়া। হাসল একেবারে তৎক্ষণাৎ, শিকড় সরসর করে উঠলে গাছের যেমন হয়, আমার সেইরকম হল। কোনো বাস্তব কারণ নেই, অথচ আমি বুঝতে পারলুম, ওর বহুদিনের গোপনতার সঙ্গে হাসি ও স্বরের সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষত এই চমকে - ওঠার। সেই তখন থেকে শু হল এক আশর্চ্য আত্মহনন, সেই মুহূর্ত থেকে, একেবারে তৎক্ষণাৎ, ওর সঙ্গে মনে - মনে - কথা - বলার এক আত্মঘাতী অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়লুম। আর বুঝলুম এই রকম চলবে, এই শু হল, যতবার মায়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে, এই রকম চলবে। এ-ই আমার নিয়তি।

মায়া বলল, 'আরে আপনি?'

আমি মনে মনে বললুম, 'হ্যাঁ আমি।' মুখে বললুম, 'চিনতে পেরেছেন?'

মায়া বলল, 'আপনারা ফিরলেন কবে। পুরী থেকে?'

আমি মুখে তার উত্তর দিয়ে মনে মনে বললুম, 'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।'

'ভাল আছেন?'

'ভাল।' (বললুম, 'শাদা শাল জড়িয়ে বসে আছো, ও-হো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।')

'কোথায় যাচ্ছেন?' মায়া জিজ্ঞেস করল।

'টিউশনিতে। আপনি এই ভোরবেলায়?'
'এই...এদিকে একটু কাজ ছিল।'
মায়া প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কেন? পরে জানতে পারব। এখুনি জেনে লাভটা কী? কিন্তু আমি কী জন্যে বেরিয়েছিলুম, এই ভোরবেলায়?
'কোথায় যাবেন জানতে পারলে টিকিটটা কাটি।'
'ধন্যবাদ। আমি একটু দূরে যাব।' আমি দ্বিতীয়বার বললুম না। কী হবে? আবার তো দেখা হবে। তখন, বছর পরে, একদিন ও কোথায় যাবে জানা থাকবে এবং টিকিট কাটার অনুমতি চাইতে হবে না।
হ্যারিসন রোড দিয়ে হাওয়া কেটে বাস যাচ্ছিল। হাওয়ায় হ্যারিসন রোডে একঝাঁক পায়রা উড়ছিল, এই উলটে গেল, ক্রমশআরো উপরে উঠে যায়। যেন শৈশবের স্বাধীনতাদিবসে, যখন কুয়াশায় 'মাগো তোমার চরণদুটি বক্ষে আমার ধরি' এই সংগীত চিত্রে অর্পিত হয়, সভাপতি পতাকা উত্তোলন করছেন নিচে, একটা কালোছিট শুভ্র পতাকা উঠে যচ্ছে পতপত করে, উপরে, আরো উঁচুতে। সেই হাওয়া কেটে হ্যারিসন রোড দিয়ে বাস যাচ্ছিল। অকারণে আমার মনে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষমাণ অমূল্য মুগ্ধতা জাগে। পাখি, বা সূর্যাস্তের আলোয় বিলীয়মান নৌকো মনে পড়ে।
জলকুলিতে রাস্তা ভিজিয়ে দিচ্ছে। অনেকেই এখনো ঘুমে অজ্ঞ, কেউ কেউ জেগে উঠে পায়চারি করছে রাস্তায়। সূর্য উঠতে পারে। কী -রকম ঠাণ্ডা - ঠাণ্ডা লাগে, কী রহস্যময় লাগে জানুয়ারির এইসব ভোর, তা অনেকেই বলে দিতে হবে না, কারণ অনেকেজানে। অনেকেই বলবে, হ্যারিসন রোডকে হ্যারিসন রোডের দর্পণ বলে মনে হয়। আমি কলেজ স্ট্রিটের একটা টিকিট কেটে, কলেজ স্ট্রিট অবধি ওর দিকে চেয়ে রইলুম, যার মধ্যে দু - একবার শাদা শালটা আরো মুড়িশুড়ি দিয়ে বসল ও, ওর কণ্ঠাদুটি জেগে রইল আগের মতো, চেষ্টায় থাকার জন্যে কথা ফুরিয়ে গেল না, একবার যখন ও জানালা দিয়ে মুখটা গলিয়ে দিল, আবার মনে হল ওর শুকনো মুখ থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে হু-হু করে --ওর সেই ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সময় কলেজ স্ট্রিটে, ওকে কিছু না - বলে, আমি টুপ করে বাস থেকে নেমে পড়লুম।

।। দুই ।।

আমি কী রকম ? ছেলেবেলা থেকে সুন্দর ছেলেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। বেচুকে দেখে মা পর্যন্ত বলেছিল, 'আহা, কী সুন্দর দেখতে রে তোর বন্ধু!' বেচু জানে ওকে কেমন দেখতে। সবচেয়ে কুৎসিত লোকও আমি দেখেছি, আমাদের অফিসের চৌধুরী। প্রথম দিন আমি চেয়ে দেখতে পারিনি। আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। চৌধুরী কি জানে, চৌধুরী বা বেচু কারো মতো নই।
আমাকে কেমন দেখতে আমি জানি না। আমার মা নেই, বাবা সওদাগরি অফিসের স্টেনো ছিলেন বলে আঙুলে বাত নিয়ে রিটায়ার করেছেন। ব্যঙ্গে, শুনেছি, বাবার টাকা আছে। দাদারা বিবাহিত, সন্তানাদি আছে, চাকরি ব্যবসা ইত্যাদিতে উপার্জন করেন।মেজদা কোনোদিন খবরের কাগজের বেতারবার্তা পড়েন না, তবে অফিসফেরত টিউশন সেরে, নিত্য বাড়ি ফিরে প্রথমেই রেডিওরচাবি টিপে দেন। একটা - কিছু গানবাজনা হোক বা কথাবার্তা, তিনি শুনতে চান। সে - সময় রেডিওতে তা হয়ও। এক-একদিন দেরি হয়ে গেলে অবশ্য, তখন রেডিও খুললে একটা একটানা কুঁই - কুঁই আওয়াজ বেরয়। বড়দা এত উত্তেজিতভাবে ভাত খায় যে,দেড়তলায় আমার এই গর্তের মতো ঘরটায় শুয়ে তার হু - হাশ শব্দ শুনতে পাই। আমাদের বাড়িতে একটাই হাঁড়ি চড়ে। আমি কিছু লেখাপড়া শিখে চাকরি করি। আরো ভাল একটা চাকরি পাব, জামাইবাবু ব্যবস্থা করেছেন দিল্লিতে, শুনেছি তখন আমাদের বাজার - খরচ দৈনিক আট - আনা হিসেবে বাড়ানো হবে। ততদিনে, নিয়ম - মাফিক হলে, বউদিদের দুটি - তিনটি ছেলেপিলে হবে।

।। তিন ।।

ঈশ্বর ধন্যবাদার্হ যে, ইতিমধ্যে যে-দুদিন মায়ার সঙ্গে দেখা হল, তার প্রথম দিন দাড়ি কামানো ছিল। জামাকাপড়ও ভাল ছিল। দ্বিতীয় দিন পোশাক ছিল শ্যাবি, কিন্তু দাড়ি কামানো ছিল। আরো একদিন দূর থেকে দেখেছিলুম। সন্তোষ গোঁফটা অত্যন্ত স, ছোট - বড় আর ছুঁচলো করে কেটে দিয়েছে সন্দেহ হওযায়, (সন্দেহ, কারণ ও সেলুনের আর্শিটা এত পারা - ওঠা, উঁচু - উঁচু আর এমন ব্যঙ্গ করে যে) আমি ওর সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে থেকে দ্রুত সরে এসেছিলুম। যা হোক, এখন

মাসের শেষ, তবু শুধু ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে একটা আর্জেন্ট পাঞ্জাবি করতে দিয়েছি। ধুতি এবং সেটা ডাইং - ক্লিনিঙে দিয়ে, কেচে আসার পর, ওর সঙ্গে পরপরদু - তিনদিন দেখা করার চেষ্টা করলে, ধুতিপাঞ্জাবি ময়লা হবার আগে ওর সঙ্গে একদিন দেখা হবে বলে মনে হয়। আর চৌধুরীবাবু খুব আন্তরিকভাবেই অনুরোধ করেছেন, 'যেদিন মায়ার কাছে যাবে, ভাল জামা - কাপড় পড়ে যেয়ো, আর চুলটা যেন আঁচড়েযেয়ো ঠিকমতো।' চুলটা যদি অল্প শ্যাম্পু করি, আমাকে কেমন দেখায়?

আজ রাত আটটা নাগাদ তিন আনায় আমি আর সুব্রের দুজনে টিফিন করলুম খাস চৌরঙ্গিতে, খিদিরপুরের প্রাইভেট ব াসগুলো যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানে। জল আর পেট্রোলে থকথক করছে জায়গাটা। একজন পাঞ্জাবি সিলিং পর্যন্ত জালে - মোড়া টিকিট ঘরটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ কেউ ব্যাগ কাঁধে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের ঘামের মন্ধ, সারি সারি লাল শালুর ওপর পাতা পান - সিগারেট, গরম আলুকাবলি, স্তূপাকার ফুচকা, ভাঁড়-ভাঁড় তেঁতুলের ঝোল--স্থান জুড়ে এখানে একটা টক্চা গন্ধ, প্রায় পনেরোকিকুড়িটা বাস হা-হা করছে ফাঁকা একটা বাসে কিছু যাত্রী উঠেছে, মোমিনপুর য াবে, কখন ছাড়বে ঠিক নেই; কিছুই ঠিক নেই!
অদূরে প্রোথিত মনুমেন্ট। আরো দূরে কলকাতার লালনীল ক্ষত দগদগ করে জ্বলছে। বেদুইন যুবতী ঘুরছে দামি শাটিনের শালোয়ার পরে, ছেলেটাকে বুকের কাছে শুইয়ে, পাশে বৃদ্ধা, পিছনে উৎসাহী কুকুর। আরও পিছনে কলকাতার একমাঠ প্রয়োজনীয় অন্ধকার।
দূ-আনার মুড়িমশলা খেলুম দুজনে। কত সুন্দর এই মুড়িঅলা, দু-গাল মুখে দিয়েইতা বোঝা গেল। ঝাল - পেঁয়াজ - অ াদা দিয়েছে, তেল দিয়েছে, সবুজ ও লাল লঙ্কার টুকরো আর টকমতো নুন দেওযায় বিশেষত স্বাদু। চাঅলাকে বললুম, 'দুভাঁড়ে দু-পয়সা করে চা দাও ভাই।' চাঅলা, আশর্চ্য, দিল। খুড়ি ভরতি করেই দিল, আমাদের দুর্বল আপত্তি অগ্রাহ্য করে দিল। সুব্রের জিজেস করল, 'ইজি দ্যা চ্যাটি বিজন?' আমি বললুম, 'চারটে মোটে পয়সা দিলুম, দুটো খুরির দামই দু - পয়সা। তার ওপর দু-আনার চা তুমি দিলে, আর এমন সুন্দর চা। তোমার যে লোকসান হল হে। কেন তুমি এমন ভুল করলে?' চাঅলা সংক্ষেপে বলল, 'কোই বাত্ নেই বাবু।' আমি ওকে একটা চার্মিনার দিলুম। কী লজ্জা চাঅলার! বসেছিল, ডান হাতটা সিগরেটসুদ্দুই নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে, বাঁ - হাতের ওপর মাথাটা রেখে মুখ লুকিয়ে এক ধরনের হ াসতে লাগল। কীসে যে ওর অমন নারীসুলভ সুন্দর লজ্জা হল, বুঝলাম না।
তারপর মনুমেন্ট অবধি হেঁটে গিয়ে, মনুমেন্টের নিচের সিঁড়িতে আমি বসলুম, সুব্রের বসল সবচেয়ে ওপরের ধাপে। শীত এলে একাকিত্ব বড় কষ্ট দেয়। কুয়াশায় স্পষ্ট দেখা যায় না কিছুই।
চেঁচিয়ে বললুম, 'ভিটামিন বি - কমপ্লেক্স নিয়ে, বুঝলি সুব্রের, বেশ উপকার হয়েচে। মন কী শান্ত, বেশ সাফসুফ লাগছে শরীর।' সুব্রের তো হ্যা হ্যা করে হেসে উঠতে পারত, ট্রামে ওঠার আগে ও মেন বলল, 'এমন গভীর ভালবাসা তোর। এমন গভীরতায় যার শু তা কেন ভেসে উঠবে? ওকে তুই পাবি না, দেখিস।'
সমুদ্র থেকে হাওয়া বহু দূর দেশ অবধি যায়। আমি তার থেকেও দূরে। হু-হু করে এত হাওয়া লাগে কেন।

।। পাঁচ ।।
'কোন অফিসে না - শুনলেন। ধন, ওই - ওই দিকের একটা অফিস! আপনি তো ডালহৌসিতে যান?' বলে তৎক্ষণাৎ মায়া বলল, 'চলুন, ওই ব্যালকনির নিচে দাঁড়াই।' সম্মতিসূচক যা বলার বলে, আমি ওর স্বর যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আসুক না বৃষ্টি। ভেজো না তুমি, বৃষ্টিতে? বৃষ্টি থামার পর জলের ফোঁটা ও তার লম্বা ছায়া পড়ে বিন্দু - বিন্দু তোমার মুখ এমন হয়, সে - ও তো দেখার।'
ব্যালকনির নিচে দাঁড়িয়ে মায়া বলল, 'ও বাবা, এ যে ঝমঝমিয়ে এল। ঈশ, লেট না হয়ে যায় আবার।'
'বিকেলের আগে থামছে না।' হেসে বললুম।
'ইশ! কক্ষনো না।' হেসে বলল।
মুখ শুকনো করে বলল, 'আমাদের বড়বাবু বুঝলেন...'

'আমাদেরও বড়বাবু...' মুখ শুকনো করে বললুম।
প্রতিমার কল্কার মতো ওর কানদুটি কঁপে উঠল নাকি, যখন আমার হাতের ছায়া ওর মুখটা দু-হাতে ধরে, একবার এই ক াননে, একবার অন্য কানে মুখ রেখে অনেকবার বলল, 'কখনো দেখিনি। হয়ত চন্দনের ফোঁটা - মাখা কানের মুখের মতো হয়।'
'আপনার মা - বাবা আছেন?'
'তোমার হাতটা ধরব?'
'কেউ নেই?'
'না।'
'ভাই?'
'একজন যমজ ভাই। হ্যাঁ, একসঙ্গে থাকি। না, সে কিছু করে না। শুয়ে - বসে থাকে। হাই তোলে।'
চিক্কণ রাস্তা ধরে মেঘ এগিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপটায় গোটা রাস্তা জুড়ে দুলে উঠল। রাস্তার মোড়ে অ ারো মেঘ। স্বপ্নাহতের মত আমি আবার বললুম, 'হয়তো কনের মুখের মতো হয়। তাই, ভেজো না তুমি বৃষ্টিতে, ভিজবে?'
মায়া বলল, 'বৃষ্টি থেমে এল, চলি। আপনার তো ছাতা আছে?'
মাঝে - মাঝে ভ্রম হয় ও বড় বেশি কুৎসিত, কিন্তু ওষ্ঠের সামান্য প্রয়াসে পরমুহূর্তেই সে কেমন অপরূপ সুন্দরী হয়ে ওঠে! চোখের পাতা নেই, বৃষ্টিকণায় - ঝাপসা চশমার কাচের ওপর ওর চোখের চাওয়া, আসলে কি কাছ থেকে, পাশ থেকে ওকে এমন সুন্দরী দেখায়?
দু - পা এগোতেই একটা ট্রাম এসে পড়ে, আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। ছুটন্ত ট্রামে লহমায় লহমায় মুখ, বৃষ্টির ছাট এসে পায়ে পড়ছে আমাদের দুজনেরই, কী সামান্য দূরে কাঁপছে ওর ওষ্ঠ, সামান্য দূরে ওর অধর স্থির, চূর্ণ হবার মুহূর্ত পর্যন্ত কেঁপে উঠে গম্ভীর জলস্তম্ভের মতো আমার শরীর সেই মুহূর্তে ওর ঠোঁটদুটির উপর আছড়ে পড়তে চায়
ট্রাম চলে গেছে। বৃষ্টি ধীরে ধীরে থামল। একই ছাতার নিচে আমরা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। টপ করে একটা ফোঁটা পড়ল ছাতার উপর। মানুষের ঠোঁট অত শুকনো হয়?
আদর - করা গলায় জিজ্ঞেস করলুম, 'পুরীতে আগে গিয়েছিলেন নাকি?' যেন ফের, 'অত শুকনো কেন তোমার ঠোঁট', জানতে চাইছি।
মায়া উত্তর দেবার জন্যে মুখ তুলতেই, চাকিতে আমি বোধ হয় কাউকে চুমু খাওনি বলে, না?
মায়া না। পুরীতে ওই একবার।
আমি এএএ...আচ্ছা জলে চুমু খাওনি, বিকেলে, যখন গা ধোও?
'হ্যাঁ', ঘাড় হেঁটে করে মায়া বলল, 'কোনারকে গিয়েছিলুম।'

।। ছয় ।।

আমাকে একেবারে অন্যরকম দেখতে ছিল। আমি আপার - ডিভিশন ক্লার্ক, ভাইয়েরা একসঙ্গে আছি, সংসারে অল্প টাকা দিতে হয় বলে আমার হাতে কিছু টাকা থাকে। আহিরীটোলায় প্রপিতামহের তৈরি আমাদের একটি ছোট দোতলা বাড়ি আছে, যেখানে দাদাদের সংসারে, নামমাত্র খরচায় আমি বেশ দিব্যি ছিলুম। শুধু মাঝে - মাঝে ধুতি একটিমাত্র এবং জামা পাঁচ - ছটি হয়ে গেলে, উদ্বৃত্ত জামার সমস্যায় আমি অত্যন্ত অসহায়, বিব্রত ও কখনো - বা বিরক্ত বোধ করতুম।
আমরা জেঠিমাকে, 'মা' বলে ডাকি। জেঠিমা দেওয়াল ধরে পাশ দিয়ে চলাফেরা করে, মাঝে মাঝে বলে, 'হ্যাঁরা, বাবা বিজু, তুই আমার কাগজপত্রগুলো দেখবি?' মাকে আমি সম্পূর্ণ ভুলতে পারিনি, মাকে আমার একমাস কি দুমাস অন্তর মনে পড়ে।
যে-পেনটায় লিখছি, এটা দিয়ে ভকভক করে কালি বেরয়। ভকভক করে এ ছাড়া যা - যা বেরয়, সবই ঘৃণা করি, যেমন ম ানুষের সেন্টিমেন্ট। যা হোক, ক্যাপ খুলে আমি মশারিতে কালি মুছলুম, রোজই মুছি। এ-কথা ভাবতে ভাবতেই মুছি যে, মশারিটা আমার বিধবা দিদি পরশুদিন সোডা - সাবান দিয়ে কেচে খুবই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। পেটে একটা ছেলে থ

াকলে কী হবে, বউদিকে কিছুদিনের মধ্যেই আবার একটা কাচতে বলতে হবে। এইমাত্র আমি জানালার জালের গায়ে থুতু ফেললুম, গয়েরও ফেলি আমার শাদা চাদরখানা, রোদ পড়লে, লা - কালে একটা শতরঞ্চি হয়ে দাঁড়ায়। বিকেলের কথ ায় মনে পড়ল, সন্ধের আগে আমার রোজ মাথা ধরে, আমি সারাদিন দুর্বোধ্য চার্মিনার খাই।

বছরখানেক আগে প্রথম বর্ষার দিনে একবার আমি বাড়ি ছিলুম, বিকেলে মেজদার বাচচা বুচুকে নিয়ে গেলুম ছাদে, ছুটে বৃষ্টির মধ্যে চলে গেল, ছাদে গড়াগড়ি খেতে লাগল -- দেখে, আমি একে ভালবেসে ফেললুম। একটি শিশুকে ভালবাসতে পারছি, আমি দেখলুম। কিছু পরে ওর গা - হাত মুছিয়ে দিলে, বুচু পকেট থেকে একটা লাল বেলুন বের করে বহুকষ্টে ও দীপ্তমুখে তা ফোলাবার পর, মনে আছে, একটা ছোট্ট পিন দিয়ে আমি সেটা ফুটো করে দিয়েছিলুম।

আমি শেষপর্যন্ত ভালবাসতে পারতুম না কোনো কিছুই, আবার কাকে খুন করার ইচ্ছেও আমার কোনোদিন হয়নি। র াগ, ঈর্ষা, অভিমান -- এ সব কিছুই আমার হত না। পৃথিবী ও মানুষকে আমার মনে হত একটা ছিবড়ে, কালক্রমে নিংড়ে অভিজ্ঞতা যার থেকেই সবাই নিয়ে নিয়েছে।

বন্ধুরা পটাপট প্রেম করলে আমার ঈর্ষা হয়েছে বলে মনে করতুম শুধু এ - কারণে যে, তা করে একটা প্রকারান্তর যৌনতা তারা পায়। প্রেম করার নামে প্রায় সকল বন্ধুর আলজিবে জল পড়া এমন যে, যে-কোনো বুদ্ধিমান দালাল একটি আস্ত নপুংসককে মনোমাফিক মেক - আপ দিয়ে তার মানসী করে দিতে পারে। উদ্দেশ্য মহৎ, নারীর প্রেম, তবুও পা-টিপে পা - টিপে সেদিকে এগোনো কি উচিত? কিন্তু কে শোনে কার কথা! কোনো স্মৃতি নেই, বিস্মৃতি তো পরের কথা, আমার যুবক - বন্ধুদের লোভ ছাড়া কোনো ঔদাসীন্য নেই দেখে আমার মনস্তাপ ছিল।

কেননা, প্রেম হয়। কেউ করে কি? অন্তত প্রেম করার জন্যে আমি কখনো কোনো মেয়েকে অনুসরণ করিনি।

আমি বরং গণিকালয়ে গেছি। প্রেমহীন দেহ ভোগ করতে গিয়ে আমি বিফল হয়েছি সত্য, তবু আমি চরম পাপ করিনি। আ মি কখনো ও কিছুতেই কোনো গণিকার ওষ্ঠ-চুম্বন করিনি।

আমি প্রায় সব কিছুকেই মিথ্যে ও ভুল বলে জানতে শিখেছি। সবচেয়ে বেশি ভুল ও সন্দেহজনক মনে করেছি আমার অ ান্তরিকতাকে। তবুও কোনো ভোর ভাল লাগলে বা পৃথিবীর বিখ্যাত সিনারিগুলির অন্যতম গড়ের পিছনের সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হয়ে আমিকাঁধে হাত রেখেছি নিজের, 'সত্যি তো, নাকি বই পড়ে শিখেছি?' জিজ্ঞেস করেছি, 'বা, এইরকম প্রচলিত বলে ভাল লেগেছে?' ভাল - খারাপ মিশিয়ে ভীষণ জটিল ব্যাপার খুলে দেখতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে জানতে চেয়েছি, 'এ কি প্রকৃত, বিস্ময়, না ভাণ?' দুঃখের ফেরানো মুখরেখা আদরে বারবার আমার দিকে ফিরিয়ে বলেছি, 'দুঃখ, তুমিও কি মিথ্য া।'

প্রেমে পড়ে আমি এই দেখলুম, গ্রন্থকে বিশ্বাস করে পড়ে গেলে যেমন, প্রেম সে-রকম উচ্ছ্বসিত কিছুই নয়। প্রেম, এমনকী, একটা আবেগহীন ব্যাপার, ক্ষণিকের সুনিদ্রার পর এ যেন আগের মতোই সব ঠিকঠাক দেখা। আমার এক বন্ধুর মা যেমন হাসেন, প্রেম সেইরকম--- হোয়াইট লাফটার, আমি পড়েছিও একটা গ্রন্থে। ভালবাসা, আমি ভালবাসতে গিয়ে দেখছি, শুধু ভালবাসার বাইরেই নয়, সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের বাইরে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে।

'মাসখানেকের ছুটি নিচ্ছি, এখানে কিন্তু আর দেখা হবে না।'

'ক - মাসের?'

'এক মাসের।'

('অসম্ভব। ন্না - না--')

'ঠিকানা মনে থাকবে তো', মায়া বলল, 'গেছেন ওদিকে?'

প্রাণপণে মনে রাখার চেষ্টা করছি কেন? একেও কি মনে রাখা বলে নাকি, এ তো ভুলে যাবার বিদ্ধে সতর্কতা, একাগ্রতা। কারণ, দ্রুত - ভুলে - যাওয়া একে ছেঁকে ধরে কী নিঃশব্দে। কী বললে। ৪ঙ্গ২এ, না-ন্না, ৪ঙ্গ২ঙ্গ২, না, শশী সুর...লেন? না - না---

('না - না। তুমি কিছুতেই আমার চোখের দিকে চাইবে না, মুখের উপর চাউনি ফেলে রেখে খালি ফাঁকি দেবে, সে হবে ন া।')

'কখন যাব বলুন তো?' আমি জানতে চাই।

'সন্ধের পর আসবেন একদিন। বাবার সঙ্গেও দেখা হবে।'
'সামনের সপ্তাহে যাব?'
'ঠিকানা মনে আছে তো!'
আছে কি? পরে মনে করে দেখলে বুঝতে পারব।
বললুম, 'আছে।'
'ও!' আবার সেই আমূল চমকে - ওঠা, 'বাস আসছে। কটা বাজল দেখুন তো?'
পাঞ্জাবির হাতা সরাতেই ওর মুখ আশাময় উজ্জ্বল হয়ে উঠল কেন? আমার ঘড়ি আছে এই দেখে? ওর অনুমান সত্য এই জেনে? ওর কাছে একটা পেন্সিল আছে, অকারণে জন্ম নিয়ে এই বিশ্বাস আমার মধ্যে বদ্ধমূল হতে দেখি। থাকবে না বা কেন!
'আপনার পেন্সিলটা দিন তো?'
'কী!'
'নেই?'
মাথা নিচু করতে বাধ্য হল। পেন্সিলটা ব্যাগ থেকে বের করে বাড়িয়ে দিল। আ, করলে পেন্সিল! পিছন ঘোরাতেই সীস বেরয়। চার - এর দু - এর...?
মায়া হেসে ফেলল, 'ওম্মা! ও কীসের ওপর লিখছেন?'
ও হাসছে। মুখে মাল চাপা দিয়ে কুলকুল করে হাসছে। হাসিটা আমার পক্ষে ভাল কি? আমাকে কি অসহায় দেখাচ্ছে? দাই কাটা থাকলে আরো শীত - শীত লাগত। ও কি আমাকে বাঙাল ভাবছে? ও নিশ্চয় ভাবছে এর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।
বললুম, 'আমার কাছে কাগজ নেই।'
'তাই বলে নোটের জলছাপের ওপর?' কেবল হাসি দিয়ে ঠোঁটটুকু ভিজিয়ে রেখে কৌতুকে অস্থির হয়ে উঠে মায়া বলল। 'আপনার কাছে কাগজ আছে কি?'
'না হয় নেই', অনেকটাই পায়রার মতো ডানার আড় ভেঙে ও অবিকল কুহর কেটে সে বলে ওঠে, 'বেশ বাবা, ওতেই লিখুন।'
ছানার জলের মতো নীল কুয়াশায় শ্যামবাজার ডুবে রয়েছে এখনো। বেলগাছিয়া দিকটা আদৌ দেখা যায় না। দূরে রেল - ব্রিজের উপর থেকে একটা কালোরঙের পুলিশভ্যান নেমে আসছে নিঃশব্দে। কুয়াশা বাসটাকে কত মন্থর ও ফিকে করে দিয়েছে, দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা। গাড়িটা সোজা আসছিল এইদিকে, আমাদের কাছে পৌঁছে অকস্মাৎ চাপা গর্জন করে ওঠে, কেননা ঢাকা - গাড়ির ভিতর থেকে এই সময় কয়েদিদের সমবেত জয়ধবনি শোনা যায় - কারণ, সম্ভবত, আর জি কর হাসপাতালের পিছনে এই মাত্র সূর্য উঠছে। দূরে রশ্মিরেখা দিয়ে সাজানো রেলওয়ে ব্রিজ মূর্তিমান ধাঁধার মতো দাঁড়িয়ে।
'চার - এর...?'
চোখ নাচিয়ে মায়া বলল, 'এর মধ্যেই?'
'মাসখানেকের ছুটি নিচ্ছি।' অন্যমনস্ক গলায় বলল কি? ও বলল, 'এখানে আর দেখা হবে না।' 'কেন' জিজ্ঞাসা করার বদলে আমি বিষাদ খুঁজেছি দেখে, যেন - বা ওর বিস্রস্ততার ফাঁক দিয়ে স্তন দেখা যাচ্ছিল, এমনি ভাবে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে মায়া বলল, 'ও কী! নিন, লিখুন চটপট।'
'চলি!' পাগলাটে গলায় বলল।
আবার জয়ধবনি! কুয়াশার ভিতর সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে - যেতে ওয়্যারলেস - এর ছিপটি থেকে ঘন - ঘন পা চকচকিয়ে ওঠে।
ফুটবোর্ডে পা রাখতে ভিড় ওকে গ্রাস করল। মায়া জানালার ধারে এসে বসে। তার ডান গাল চুলে ঢাকা, কানে গাঁথা সোনার যুঁই। খুব ঠণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ শীতে আমার ঠোঁট ফেটে যাচ্ছে। মায়া হাত ঢুকিয়ে নিচ্ছে শাদা সালের ভেতর।

'না - না, শার্শিটা তো কুয়াশায় ঝাপসা, আমি তোমার খোঁপায় - রাখা হাত দেখছি, এ তুমি সরিয়ে নেবে কেন?' আমি বলি অথচ আমাকে মুখ খুলতে হয় না। ঠোঁট ব্যবহার করতে হয় না। গাড়ি স্টার্ট নেবার আগে যাবার বেলা উচচারণ করে পিছু ডেকে আমি বললুম, 'তোমাকে একটা কাকার্য - করা মাল কিনে দেব একদিন।'

আমি এসপ্ল্যানেডের একটা ট্রাম ধরলুম। ভুল ট্রামে উঠেছি, এটা গ্রে - স্ট্রিট - চিৎপুর দিয়ে অনেক ঘুরে যাবে, তা যাক। অ ামার অফিস যেতে দেরি হয়েই গেছে। কদিনই মাঝে - মাঝে হচ্ছে, আজও যেতে - যেতে বৃষ্টি নামল। গণেশ টকির কাছে পৌঁছে ঢং ঢং ঢং ঢং করে একটা পাগলাঘন্টির আওয়াজে চমকে উঠেছিলুম। দমকল, মনে হল। এই বৃষ্টির মধ্যে আবার অ াগুন লাগল কোথায়। ছুটে গিয়ে ট্রাম থামল ঠিক একটা মন্দিরের সামনে। মন্দিরে আরতি হচ্চে। এমন অশুভ মনে হয়েছিল মন্দিরের সেই আরতি।

কন্ডাক্টর টিকিট চাইল। আমি আমার হাতটা লম্বা করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলুম।

'খুচরা নেহি?'

'খুচরো!'

কন্ডাক্টর নোটটার বদলে বহু খুচরো আমাকে দিল। খুচরোয় আমার দু'পকেট ভারী ও ভরতি হয়ে গেল।

।। আট ।।

আমি কর্পোরেশন গিয়েছিলুম। পরিচিত বন্ধু রেকর্ড দেখাল। রাস্তাটা কি শশী সুর লেন বলেছিল, না বাই - লেন? লেন হলে ৪/২/২এ, না ৪/২এ, না ৪/২? ৪/২ ও ৪/২এ আছে বাই - লেন। প্রতিটি ভাড়াটের নাম লেখা আছে রেকর্ডে। পদবি জানি। পাঁচজন মিত্র ওই তিনটি বাড়িতে আছে।

লেন কি বাই - লেন,। ৪/২/২ এ নেই কোথাও! না থাক, কিন্তু কী করে অতগুলি বাড়ি হানা দেব, বিশেষত, একটি মেয়ের নাম ধরে কতগুলি দরজায় ঘা দিয়ে ডাকব?

কোন অফিসে চাকরি করত, তাও জানি না।

অথচ ওর ঠিকানা ভুলে গেলুম, কেন গেঁধে নিইনি মনে। কী করব, ওর সামনে যতবারই দাঁড়িয়েছি, বেকুবের মতো হতবুদ্ধি, চোকমুখ লাল হয়ে উঠেছে আমার। প্রতিবারই ও ভেবেছে , আমি নিশ্চিত বাঙাল এবং এর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি। বিস্মৃতি নাকি সে স্মৃতির - স্মৃতি, আমি জানি না যা আমাকে ছেঁকে ধরেছে, ওর সামনে দাঁড় ালেই! এই কারণে যে, কারড়ও ভেবে দেখেছি, ওর সম্পর্কে আমার একটা গোপনতা রয়েছে। ওর কী, ওর তো কোনো সিক্রেট ছিল না।

আহাম্মক আমি কি অভিশপ্ত নাকি, যে নোটটা কন্টাক্টরকে দিয়ে দিলুম। কেন আমার কাছে খুচরো ছিল না। কেন? আমি জাতিস্মর নই যে, ওর ঠিকানা আমার মনে থাকবে।

।। নয় ।।

বছর দশেক আগে ছেলেবেলায় সন্ধ্যার ধবনি ছিল শাঁখে।

ছেলেবেলার কথায় মনে পড়ল, বছরদশেক আগেও আমার বয়স তখন ষোল, ফার্স্ট - ইয়ারে পড়ছি, প্রথম দিন কলেজ হ াফপ্যান্টুল পড়ে গিয়েছিলুম এমনি বোকা, আসলে আমার ভুল ধারণা ছিল যে, ছেলেবেলাটা বোধহয় বেশি দূরে ফেলে আসিনি, আরধরা পড়ে শুধরে গেল। কিন্তু সে যা-ই হোক, মনে পড়ে ছেলেবেলার সরস্বতী পুজোর দিন খুকু যেদিন প্রথম শাড়ি পরল হলুদ - ছোপানো, সেই প্রথম দিনেই ওকে বলেছিলুম, 'এই আমায় বিয়ে করবি'। ও বললে, 'তোর মায়ের সব গয়নাগুলো দিবি', আমি নাকি বলেছিলুম, 'দাও না মা।' মা আমার গা চাটত, বলত, 'স্কুলে পড়া পারিসনি তো?' বলত, 'আজ তোকে দুটো পয়সা দোব বিজু,কী কিনবি?' আমি নাকি বলতুম 'বুড়ির চুল।' 'কাউকে বলিসনি যেন তোর ব াবা আমাকে মেরেছে, বলবি, পড়ে গেছি, পুড়ে গেছি, বুঝলি?' মা আমাকে বলেছিল।

বলত, 'তুই এবার ফার্স্ট হবি।'

ছেলেবেলার সন্ধ্যায় ধবনি ছিল শাঁখে। ভূমিকম্প না - হলে কেউ কি আর শাঁখ বাজাবে না?

।। দশ ।।

সেই সকালে অফিস যাবার জন্য বেরিয়ে আজ আর বাস থেকে নামলুম না। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত বাসে - বসেই ঘুরে বেড়ালুম। একবার এ-বাসে উঠি, একবার ও-বাসে। সারা কলকাতার কত রাস্তা কতবার যে ঘুরলুম।

লাস্ট বাসে একটা ঘটনা ঘটল। বিরক্তি, ক্লান্তি বা শূন্যতা হয়ে বসে আছি এক কোণে, হঠাৎ ফুলের ঘ্রাণ এল। কী ফুল! একবার মনে করার চেষ্টা করে মনে পড়ল না দেখে, আর সে-চেষ্টা করলুম না। তারপর একটা কটু গন্ধ পেলুম তামাকের। তামাকের গন্ধ বাসে উঠতে, ফুলের গন্ধ বাস থেকে নেমে গেল। কিছুতেই দুটো গন্ধ মিশল না।

কিছুক্ষণ পরে শুধু ফুলের গন্ধ পেলুম। চেনা ফুল। এক ভদ্রমহিলা, বছর তিরিশ, পাতলা গড়ন, কিশোরী মেয়ের মতো ছোট ছোট স্তন, শরীর ধসে যায়নি বহু বছরের দাম্পত্য সত্ত্বেও, দেখে আমি প্রীত হয়েছিলুম। ভদ্রমহিলা স্বামীকে নিচু গলায় কী বললেন, তারপর আঁচলের গিঁট খুলে ফুলওলার কাছ থেকে কিনলেন ফুলের মালা।

অশ্লীল, অশ্লীল। সমস্ত ব্যাপরটা কী - যে অশ্লীল লাগল আমার! বাসসুদ্ধু লোকের সামনে ফুলের মালা কেনা, পাশে প্রচলিত চেহারার স্বামী, ধরা যাক প্রেমিক - স্বামী (তাহলে তো চূড়ান্ত অসভ্যতা!), এর চেয়ে অশ্লীল আগে কিছু দেখেছি কি? অনায়াসে নির্জনে ও একা ফুলের মালাটা কিনতে পারতেন, বাসে গন্ধ পর্যন্ত লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরো শোভন হত।

এই বিনবিনে ঘাম, পেট্রোলের গন্ধ, চোখ, সর্দিকাশি, কন্ডাক্টরের চিৎকার--- প্রকাশ্য আলোয় এই ফুলমালা কেনা দেখে, পটপট করে ব্লাউজের বোতাম খোলার মতো তাঁদের শোবার ঘরের মধ্যরাতের জানালাগুলি আমার চোখের সামনে খুলে গেল।

।। এগারো ।।

দেওয়ালে ক্যালেন্ডারে ঈশ্বরের ছবি ঝুলছে। মঙ্গলবারের নিচে রয়েছে পাঁচটা তারিখ---১,৮,১৫,২২,২৯। কোনো - এক ৮ই মঙ্গলবার ও ৯ই বুধবার এ-কথা ক্যালেন্ডারে রয়েছে। কিন্তু এই যে আজ, আজকের এই দিনটা, আজ মঙ্গলবার না বুধবার ৮ই না ৯ই, এটা বোঝার কী উপায়? মানুষ কি এমন কোনো উপায় আবিষ্কার করেছে, যাতে করে আজ, এই আজকের দিনটা, ৪ই না ৯ই, মঙ্গলবার না বুধবার এ-কথা নিশ্চিতপক্ষে বলা যায়? যদি ধরেই নেওয়া যায় এটা মার্চ মাস, ১৯৬১ সাল, তাহলে ক্যালেন্ডার থেকেএটা অবশ্য যথেষ্ট স্পষ্ট যে আজ ৮ই হলে, হলে তবে, মঙ্গলবার ৯ই হলে যেমন বুধবার। এবং উলটোদিক থেকে আজ যদি মঙ্গলবার হয়, হলে ৮ই নিশ্চিত, বুধবার হলে অনস্বীকার্য ৯ই। কিন্তু আসলে আজ মঙ্গলবার না বুধবার, ৮ই না ৯ই?

।। বারো ।।

আমাদের আদিকবিতার প্রথম বাক্য শু হয়েছিল 'না' দিয়ে।

জানি না কখন আসবে, ঘুম আসছে না। প্রায় মাসখানেক ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। দিনে সারা শরীরে ঘুম নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ঘুমের দিকে অবিরাম, অবিরাম ভারে নত হয়ে পড়ে শরীরময় সমস্ত জীবন, জীবনের সরল সত্য ও একমাত্র দর্শন মনে হয় ঘুম, যা প্রগাঢ়তম ঘুমে বিলীন হতে চায়। অফিসে যাই, জেগে কাজও করি, আজকাল হঠাৎ ওজন দেখে শু করেছি। অফিসের পর একটা রেস্তোরাঁয় বসে পুনরায় অপরাহ্লকাল এসে যায়, নরনারীর নতমুখ শোভাযাত্রা দেখি কোনোদিন, চোদ্দতলা অট্টালিকার প্রস্তুতিপর্বের দিকে চেয়ে, 'বলেছিনু, ভুলিব না যবে তব ছলছল আঁখি' সম্পর্কে করমচাঁদ থাপার কী ভাবে, ভাবি; লটারির টিকিটের জন্য লাইনটা, দেখি, বেলাশেষে ছোট হয়ে আসে।

কোনোদিন মোহনবাগান মাঠের পিছনের অন্ধকারে বসে থাকি। একদিন ইডেন - গার্ডেনের কাছে গ্যাসপোস্টের নিচে হড়হড় করে একঝলক লাল উছলে পড়ল, কাছে এসে ঠোঁট লাল, চুনি লাল, কারে কুণ্ডল লাল, লাল শাড়ি - পরা একজন ঢ্যাঙা হিজড়ে এসে দাঁড়াল। আমি ভয় পাইনি, কিন্তু সে যখন কাঠের স্বরে বলল, 'কোনো ভয় নেই। তুমি বসে থাকো', তখন আমি আঁতকে উঠেছিলুম, যখন, দূরের রাস্তা উঠল চকচকিয়ে, একজন মাতাল নাবিক চেঁচিয়ে উঠল,

‘ফিটঅন’, ও ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে দীরে থামল। হিজড়েটা ফোর্টের দিকে একটি উঁটু টিলায় উঠতে আবার তার উদ াসীন আধোজাগা গান শুনতে পেলুম।

জানি না, কখন আসবে, ঘুম আসছে না। গত মাসখানেক ধরে আমার ঘুম হচ্ছে না। পরশুদিন ছিলুম পুলকেশের হস্টেলে, তিনটে সোনেরিল ট্যাবলেট খেয়েও ঘুম এল না দেখে আমার ভয় হয়েছে, এ-রকম তো হয়নি যে আমার আর - সব একে - একে ডুবে গিয়ে আজ বেঁচে আছে শুধু চোখদুটো? তবে কি আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? সত্যি, এত দুর্বল লাগে। কাশলে বুকে লাগে, ভাত খেতে গেলে কষ্ট হয়, মনে হয় যে - পেশীগুলি গলাধঃকরণের ব্যাপারে সাহায্য করছিল, সেগুলি আর পারছে না। মায়ার জন্যে কিছুই অনুভব করি না আর। প্রকৃতপক্ষে ও মুখ ভুলে গেছি।

কিন্তু তখন শোনা গেল না যখন ভালবাসতে গেলুম, কেউ বলল না, ‘সাবধান!’ কেন গেলুম, অপ্রেম আমাকে অনেক দিয়েছিল, বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল, অমন চাঁদ দেখিয়েছিল যা থেকে কেবল অন্ধকার ঝরে পড়ে, আর এক-পা বাড় ালে সেই আর্তনাদহীন আধাঁর, মুহূর্তে আমি চ্যুত হতে পারতুম। হেমন্তের অবিরল পাতার মতো টলতে - টলতে নেমে যেতে পারতুম নিচে। কিন্তু যে - মুহূর্তে পা তুলতে গেলুম, হায়, টালমাটাল, ধবনিত - প্রতিধবনিত বাল্মীকির গলা আমাকে ডেকে বলল ‘মা নিষাদ!’

।। তের ।।

গ্যাসের আলো নিবে যাবার পর ও সূর্য ওঠার পর, আজ সকালবেলা দূর থেকে মায়াকে দেখলুম। দুটি বিনুনি করেছে চুলে, চুলেরবিতর দিয়ে চিকচিক করছে সোনার যুঁই, চুলে ওর ডান গাল ঢাকা। বসন্তকালে, এ-রকম ভোরে, লাল বাস-স্টপ ভোলানো গ্যাসপোস্টের নিচে ও দাঁড়িয়েছিল। বনমহোৎসবের একটা ছোট গাছের কবিপাতা ঢেকে রেখেছে গ্যাসের বাল্বটা, ভোরবেলায় প্রিয়তম রোদ্দুরে পাতাগুলো তাকে ঘিরে ঝাড়লণ্ঠনের মতো দুলছিল। সহসা একটা আলোকিত প াতা উলটে গাছটা তার অন্ধকার দিক দেখায়।

রাস্তা জনহীন। ফুটপাতের উপর জাল ফেলে সারি সারি আরো গাছ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে। ফুটপাতে শ্যু-এর শব্দ তুলে দূর থেকে হেঁটে আসছে একজন লোক, তার গায়ে গলাকাটা শার্ট। যেন পদক্ষেপ গুণে - গুণে সে এগিয়ে আসছে, ওর ক াছে গিয়ে থামল,পাশে দাঁড়াল। ধুলো উড়িয়ে লোকবোঝাই বাস চলে গেল না - থেমে। সকালের লালধূলো - ওড়া সিন্দুরাভ আলো মায়ার পায়ের দিক থেকে উপরে উঠছে ঘূর্ণি দিয়ে, কুশণ্ডিকায় কুনকে থেকে সিঁদুর ঢালার সময় যেমন হয়, ধুলোটে সিঁদুরে ওর গা ভরে যাচ্ছে, দুই গালে লাগল, সমস্ত মুখ রক্তাভ সিঁদুরে ঢেকে গেল, চুলগুলি ওড়াউড়ি করছে তার উপর। একটা বাস গেল, আর একটা বাস থামল। ঘসা কাচের ভিতর দিয়ে হ্যান্ড্রেল ধরার জন্য উত্তোলিত শঁ াখা - পরা শাদা হাতটা পলকের জন্য দেখা গেল একবার, তারপর ভিড় এসে ওই নিমজ্জমান ব্যাকুলতা গ্রাস করল।

তারপর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপর রেস্তরাঁয় একটা কাকার্য - করা পাখার নিচে বসে, আমি ফুটপাতের ধারের কা র্নিশেনির্জন পায়রার একটা ছবি দেখতে লাগলুম। ওরা সবাই উঠতে গেছে, ও যায়নি কিছুতে। ও ভোরের রাঙা পা - দুখানি বিস্মৃতিতেডোবাল। কেউ জলে ঢেউ দিচ্ছে না, দেখতে - দেখতে লাল হয়ে উঠল সারাপুকুর, পুকুর ও আলতাম াখা পা - দুখানি ধুয়ে দিচ্ছে। সারাদুপুর রাস্তা দিয়ে মেঘ গেল। সন্ধ্যা হলে, গা ধুতে এসে জলে ঢেউ দিল কে? রক্তের পুকুরে সর পড়ছে শাদা, একটা শাদা শালুক সুখে ভাসছে, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমি দেখে এলুম।

এখন অনেক রাতে বিছানা পেয়েছ
শান্তিনিস্তব্ধতা
এখন ভেবো না কোনো কথা
এখন শুনো না কোনো স্বর
নির্জন ঘর
রক্তাক্ত হৃদয় মুছে
ঘুমের ভিতর
রজনীগন্ধার মতো মুদে থাকো।

।। পোনেরো ।।

রেণুর কাছে গিয়েছিলুম।

আর একজন লোক আসতে ও বের করে দিল। পূর্ণেন্দুর ওখানে গিয়েছিলুম। রসা রোড থেকে হেঁটে এলুম। সমস্ত পথে গভীররাতের কয়েকটি লোক উলটোদিকে হেঁটে গেল। পার্ক স্ট্রিট ছাড়াতে অট্টহাস্য করে উঠেছিল কয়েকজন। তারপর থেকে চোখে - জড়িয়ে যাওয়া রাস্তা। ফুটপাত - বদল। রাস্তা। ফুটপাত - বদল। বাড়ি। পাঁচিল - টপকানো।

আজ অমাবস্যা। কালোর মধ্যে মিশে যাচ্ছে বলে, একটা কাক অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠল, কঃ কলে জল পড়ছে টপটপ। কার বিশাল চৌবাচ্চা ভরতি হচ্ছে? বা, রাত্রির বুকে বুজকুড়ি উঠছে। বা, দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মতো শব্দ হচ্ছে। রাত দুটোর আর দুপুর দুটো কি একরকম? কোথায় ঘন্টা বাজছে, মন্দিরে, তে রাতেও! দুপুরবেলা গলি দিয়ে কাঁসি বাজিয়ে ব াসনঅলা যায়, এই রকম আওয়াজ হয় । না, মন্দিরে না, দেখেই তো এলুম, মোড় রক্ষেকালী - পুজো হচ্ছে। রক্ষেকালীটা কী কালো! জিভ লাল টকটকে। তৃষ্ণায় 'কা' করে ডেকে উঠলে, কাকের জিভ যত লাল, তত । মা আলতা পরত, সিঁদুরে মুখ ঢেকেশ্মশানে গিয়েছিল।

ভালবাসা বলে কি কিছু নেই, প্রেম বলে! ঘৃণা, নরহত্যা, পাপবোধ, এগুলি কি মানুষের সঙ্গে অসম্পর্কিত? কাকে কেন ভ ালবাসি না, নিজেকেও না, কেন কাকে হত্যা করার ইচ্ছে আমার নেই।

ও! একটা শেয়াল জল খাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় চমকানো ছোরার মতো চকচক শব্দ উঠছে। আর এই অন্ধকার, এই আভা অ ার অন্ধকার, ঘাতকের বিবেক তৃপ্ত হয়, তার তৃষ্ণা মেটায় যা।

কী কষ্ট দিয়েছি নিজেকে, আর সারাটা দিন। রেস্তোরাঁয় দু-চুর টুকরো টি ছাড়া কিছু খাইনি, জল খাইনি একফোঁটা, ইচ্ছেরশরীর ছিঁড়ে দিয়েছি রেণুকে। বাড়ি ফিরে ভেবেছিলুম বিছানায় লুটিয়ে পড়ব, অথচ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি বিছানার পাশে। নিজের উপর এইসব অত্যাচার করা আমার দরকার। তবু তা পারছি কই, আঃ পারছি কই, অ াঃ পারছি না। এ তো শরীরের ছালই শুধু ছাড়াচ্ছি। অনেক ভিতরে আশরির মতো চকচকে রক্তে জিভ দিতে পেরেছি কি, পারা আমার অত্যন্ত দরকার। এইরকম আমি আরো দিনকতক চালাব। এ -ও জানি, কষ্ট বিনা আমি আজও সারারাত জেগে থাকব।

কিন্তু কখনো করি, কখনো তোমাক বিশ্বাস করি না, হে ঈশ্বর, মায়াকে আমার চাই। দুঃখ ও শোক আলাদা, আমি জানি। দুঃখ আমি অনেক পেয়েছি, দেখেছি শোকগ্রস্ত শরীর! কিন্তু এ হচ্ছে ইচ্ছা। রাতের লেপের নিচে আমার উদ্বিগ্ন হাত শরীরময় খুঁজে বেড়ায়, শরীরের কোথাও কোনো ফাটাফুটি নেই। তবু কী নেই আমার শরীরের, কোনটা চলে গেছে, হ দপিণ্ড? কোন জায়গাটা খালি? অন্ধ হয়ে আমি খুঁজছি সেই জায়গাটা, যেখানে হৃদয় ছিল। তবে কি আমি আর শুনতে প াচ্ছি না, যা যা আমার জন্যে উচচারিত হচ্ছে!

অনেকদিন ধরে, অনেক নিচু থেকে ধীরে ধীরে যা জেগে উঠেছে, তা হল এই ইচ্ছা। আমার অস্তিত্বকে উপড়ে তুলে, এ এখন আমাকেই তা অর্পণ করতে পারে। আমার চোয়ালে চোয়ালে বসে যাচ্ছে, ঈশ্বর, ওকে আমার চাই।

আবার! আমার জমাট রক্ত এইমাত্র চমকে উঠল, ঢালু পাড় থেকে নেমে এসে একটা শেয়াল আবার তার ছোরা দিয়ে জলস্পর্শ করতে। ভালবাসা, চরমতম ভালবাসায় আমার চোয়ালে চোয়ালে বসে যাচ্ছে, চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে মাথা, ছুঁচলো হয়ে যাচ্ছে মুখ, সাপের ফণার মতো বাঁকানো নিহত - তীব্রতার এই শরীর কোন অনিবার্য চুম্বনে তৃপ্ত হবে! কার রক্ত স্পর্শ করে চকচক করে চাটবে ভালবাসার এই কাটা জিভ?

আমি আলো জেলেছি। টেবিলের উপর উপুড় করে আমি শিউরানিতে নরম, শিরার মতো আঙুলের হাড়গুলি দেখছি। চোখদুটোর পক্ষে আমার আয়ুষ্মান দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভবপর হবে কি?

।। ষোলো ।।

অন্ধকারে ঝুলন্ত একটা সিঁড়ি, মাঝে - মাঝে ধাপহীন, পা - ফেলে পা - ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলে, সম্মুখে একটা দরজা পথরোধ করে দাঁড়ায়। পাল্লার ফাঁক দিয়ে আসা ধুলোটে একফালি আলো, হাত দিয়ে ঠেলে দিতে পরদার মত দুলে উঠল

তা, ঘাতকের দীর্ঘ আঙুলগুলির আগে আগে শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তি রক্তকণিকা যেমন ছুটে যায়, লুকিয়ে পড়ে, হাতের ঝাপটায় উড়ন্ত ধুলো ব্যাকুলতার সেই নীল চিত্র রচনা করতে লাগল। ....ঢালু পাড় দিয়ে নেমে এসে একটা শেয়াল চোখ ঘুরিয়ে একবার বাঁ-দিক, একবার ডান দিক দেখল। তাতে অন্ধকার থেকে দুবার কাচ চিরে যাবার শব্দ হল। ...দরজাটা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলে গেল। শূন্য ডেকচেয়ারের পাশে মানুষসমান একটা মোমবাতি জ্বলছিল, টানাটানা তারকাহীন চোখ থেকে টসটস করে গরম মোম পড়ছিল তার কোল বেয়ে। দরজা খুলে যেতেই, তীরের দিকে ধাবমান হাঁসের মতো শিখাটা লম্বা হয়ে তার চঞ্চুদুটি উঁচু করে তুলে ধরল। যেন শূন্য ডেকচেয়ারে শায়িত কেউ এখুনি উঠে বসেছে, সভয়ে, দুহাতে দুই হাতল আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে দরজার দিকে, তার উৎকণ্ঠিত গলাটা ঝুলে রয়েছে। ...এক হাতে ধরা যায় না, দু-হাতে মোমবাতিটা উপড়ে ফেলার চেষ্টা করলে, তখন, শিখা থেকে ছিটকে লাফিয়ে ওঠে উলের মুহুর্মুহু বল, গা থেকে হাতের উপর টসটস করে পড়ছে ফুটন্ত মোম, দশটা আঙুল মোমবাতির গলায় চেপে বসে যাচ্ছে ক্রমশ। খড়খড়ি - নামানো প্রায়ান্ধকার ঘরে এখন চচচড় শব্দ করে মোম জ্বলছে। গলাকাটা জানোয়ারের ধড় পুরনো মন্দিরের চাতালে যেমন লাফায়, শিখাটা দপদপ করে তেমনি লাফিয়ে উঠছে। কখনো বা কম্পিত তৃণের মত ম্রিয়মান! শেষাবধি নিস্তেজ হয়ে এল, চোয়ালে চোয়াল - বসা আঙুলগুলো আরো গভীর দাগ ফেলে আরো বেশি মোম আকর্ষণ করে বসে যাচ্ছে, সাঁ - সাঁ শব্দ তুলে দীর্ঘ সময় বহে যেতে দিয়ে মোমবাতিটা শ্বাস টানল কয়েকবার, দেওয়ালে একখণ্ড আয়নায় চকমকিয়ে উঠল অন্ধকার জল, হাতের উপর দু-ফোঁটা আরো মোম গলে পড়ে-- এইসব মিলিত দৃশ্যের সম্মিলিত ও অলীক প্রয়াণের ভিতর থেকে, পোড়া লোমের নারকীয় গন্ধের মধ্যে, শিখাটা মভূমির কুকুরের লাল জিহ্বা অন্তিম তৃষ্ণায় উলটে অবশেষে নেতিয়ে পড়ল। কেউ কেউ কালীপুজোর সময় অ্যালুমিনিয়ামের তারবাজি পোড়ায়, এখন তেমনি পুড়ে যাচ্ছে। পুড়ে - যাওয়া অংশটা গুটিয়ে পাকিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে --- ও কি এক বোবাকালা, যে যন্ত্রণার ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করেছে?... সহসা ঝনঝন আশ্চর্য আলো-বিকীর্ণ - করা তারবাজির আলোয় দু-হাতে দুই পাল্লা চেপে ধরে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে মায়া চিৎকার করে উঠল, 'বাবা গো!' একবার চিৎকার করে উঠেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাধাদানের ভঙ্গিতে বাহু - মেলে - ধরা সেই অজ্ঞাত প্রতিমা, উন্মোচনের ধ্বনি - প্রতিধ্বনির মধ্যে কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে চিৎকার, ডাকসাজের কোঁকড়ানো কৃষ্ণ পরচুলায় ওর কান ও ডান গাল ঢাকা, চুল মণিবন্ধ অবধি প্রবাহিত, দরজা - চেপে - ধরা ধবল আঙুলগুলি ও মৃগকর্ণের মত রাতুল তালুর আভাসটুকু দেখা যায়। এখন সিন্দুরাভ রক্ত সিঁথি থেকে গড়িয়ে পড়ে ওর ললাটের রেখাগুলি মুছে দিচ্ছে, নিষ্পিষ্ট ঠোঁটদুটি চিতা থেকে নিক্ষিপ্ত কাঠের মতো জ্বলে লাল ছাই হয়ে গেছে। ভিজে সপসপ করছে ভ্রূ, রক্তে রক্তে সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে গেল।শুধু নিবদ্ধ চক্ষুদুটি অন্ধকারে চিরস্থির হীরকের মতো জ্বলে।

কাছে গিয়ে মোমবাতিটাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরার জন্যে আমি চেষ্টা করি, দেখলুম, দু-হাতে জড়ানো যায় না। আমার হাতদুটো আহ্বানের ভঙ্গিতে লেপ্টে রইল, আমি সত্যি - সত্যি দেখতে পেলুম আমার পিঠে, লেপ্টে রইল আমার সমস্ত শরীর। অতিকায় সেই মোমবাতির পিচ্ছিল গোড়াটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতে করতে, মোমবাতির গোড়াটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে আমাকে দেখি।

।। সতেরো ।।

পরশুদিন রাতে দিল্লিতে একটা স্বপ্ন দেখে আজ সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। বিকেলে মায়াকে দূর থেকেই দেখা গেল, অফিসভাঙা ভিড় এড়িয়ে স্ট্যান্ডের কাছে একটা কালো টু-বি বাসে বসে রয়েছে জানালার ধারে, মাথা নিচু করে, বোধহয় কোনো মাসিকপত্র পড়ছিল। এর আগে এ - রকম বাসে একা বসে থাকতে আমি কাকে দেখিনি। শ্যামবাজার মোড় এখন মলিন কিরণে ভরতি, পড়ন্ত আলোয় গৃহ অভিমুখে মানুষ গৃহ থেকে নির্গত হয়ে মানুষ সকলেই হেঁটমুখে ও বিনয় - সহকারে হাঁটাহাঁটি করছে। অদূরে একটা সাবানের বিজাপন অসময়ে জ্বলে উঠল, পুরনো বইয়ের দোকানে এসে পড়ল তার আলো, ইলেকট্রিক তারে ঝুলের মতো ধোঁয়া ও লটকানো ঘুড়ি, চুড়ির দোকানে বিচ্ছুরিত শোভার মধ্যে নিঃসঙ্গ মুসলমান, বিকেলের জানালায় দাগকাটা কিশোরী ও ওষুধের দোকানে অসম্ভব ভিড়। মুক্তির অপেক্ষায় একটি ছবির ব্যানারের নিচে রেস্তরাঁর সামনে কয়েকজন যুবক রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের সামনে অপেক্ষমাণ ডাবলডেকার ও দ

স্পতির - নিকট - প্রার্থনারত ভিখারি, ট্রাফিক - আইল্যান্ডে ঘূর্ণিয়মাণ পুলিশ বা দূরে ব্রিজের উপর মন্তর ট্রাম - এইসব দৃশ্য। উপরে জীর্ণ বারান্দায় টাঙানো ঢাকাই শাড়ি, চেকলুঙ্গি ও উজ্জ্বল ব্লাউজগুলি মনোরম বাতাসে শুকোয়, সূর্যাস্তের দীর্ঘরশ্মি স্পর্শ করলে সেগুলি খরখর করে ওঠে। এইসব হঠাৎ একসঙ্গে দেখলে মনে হয় এ - পৃথিবীতে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে কিছুই ঘটে না। ...নিচে মাটি শুঁকতে শুঁকতে একটা পুলিশভ্যান মাঝে মাঝে যাতায়াত করে।

এখন শরৎকাল। কিন্তু শ্যামবাজারে তার কোনো রূপ, কোনো চিহ্ নেই। বাসের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পর ও অনেক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর মায়া চোখ তুলে চাইল, 'আরে আপনি!'
হাসপাতাল, বেশ্যাপল্লী ও বাড়াবাড়িতে, গলির পানের দোকানে ও রাস্তার মোড়ে, চতুর্দিকে এবং এই রেস্তরাঁয় একটা প্রীতিকর সমবেত - গানের রেকর্ড বাজছিল। কেবিনে, ঝুলন্ত ঢাকা আলোর নিচে, ব্যস্ত না হয়ে, আমরা অলসভাবে কথাব ার্তা শু করলুম।
'বাবা, আমার জামাকাপড়ও সব জানেন দেখছি!' মায়া বলল।
'আগে দেখিনি তো, তাই বলছিলুম।' আমি বললুম।
'গেয়া রঙের, অথচ মজা দেখুন, সপ্তমীর দিন আমার জন্ম, জন্মদিনে বড়দি এটা কিনে দিয়েছিল বাগবাজার একজিবিশন থেকে! না, সত্যিই এ-শাড়িটা আমি আগে পরিনি।'
'অন্তত আমি দেখিনি।' সাফল্যে হেসে ফেলে বাকিটুকু বললুম শুধু ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে, 'এর আগে খালি বাসে বসে থাকতে আমি কাকে দেখিনি।'
'সাত - আট মাস দেখা নেই, কোথায় ছিলেন, কই, বললেন না তো?'
'.....'
'ও!'
'.....'
'সত্যি?' মায়া কুলকুল করে হাসতে লাগল, 'তারপর? ওখানে ওরা কী বললে?'
'.....'
'এ হে।'
'.....'
'তাই তো! আমার অফিসটা কোথায় আপনাকে বলিনি, না?'
'.....'
'ইশ , কী অ্যামবিশাস।'
'.....'
'তাই নাকি, বেশ বুদ্ধিমান তো আপনি! আচ্ছা, লোকটা কি সত্যিই ভাল?'
'আপনার ভাই নেই? তবে যে বলেছিলেন -- কী মিথ্যেবাদী আপনি!' স্ফুরিত ঠোঁটে মায়া বলল। আন্তরিকভাবে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনার মা -র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না?' শোনা গেল।
আমার দ্বিতীয়বারের কাপের কিনারায় চিনিভরতি এনামেলের চামচেটা কাঁপতে লাগল, যেন একটা শিহরন ধরে আছে দু-অঙ্গুলে, যখন ও আগ্রহভরে আমাকে অভিযুক্ত করল, 'মা নেই, বাবাকে দেখেননি, কে আছে তবে আপনার?'
এই সময় সত্যিই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমরা খুব ধীর ও অসলভাবে দেড়ঘন্টা সময় বহে যেতে দিয়েছিলুম দ্রুত। ওয়েটার বিল নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেবিনে বসেই আমি টের পেলুম রেস্তরাঁ এখন অনেক পাতলা হয়ে গিয়েছে, যারা অ ামাদের প্রবেশ করতে দেখছিল তারা আর কেউ নেই, কিছু অন্য লোকজন এখন আমাদের বেরিয়ে যেতে দেখবে।
এইসময় বাইরে ওই ফুটপাতে কী নিয়ে কাদের কোলাহল হল, পরমুহূর্তে একটা ডাবলডেকার রেস্তরাঁর সামনের স্টপে দাঁ ড়িয়ে মুছে দিল রাস্তাটা, এইসময় সহসা রেকর্ডে এক জায়গায় পিন আটকে গেল।
'এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু'....অকুল হয়ে উঠে কীর্তিনাশা গলা ভাড়াবাড়িতে ও হাসপাতালে ভাঙতে লাগল শতখানা

হয়ে, 'ক্ষমা করো প্রভু', 'ক্ষমা করো প্রভু', পিন-আটকানো রেকর্ড ভুল সুরে সুরে ঘুরে কেবলি বাজতে লাগল, বেশ্যাপল্লীতে, 'দীনতা ক্ষমা করো', 'দীনতা ক্ষমা করো', ক্রমে পিন পুঁতে গেল চাবুকের ঘন ঘন শব্দে মধ্যে রেস্তরাঁর ভিতর অকথ্য বেসুরে শিস দিতে থাকলে সেতার, 'প্রভু', 'প্রভু', 'প্রভু'...

অবর্ণনীয় নরকণ্ঠ থেকে কী আতঙ্কর সেই রক্তপাত।

আমি হাঁটুমোড়া পা-দুটো চেয়ারের তলা থেকে টেনে বের করতে করতে, ঝুলন্ত, ঢাকা আলোর নিচে টেবিলের উপর করে রাখলুম। গুলিয়ে - যাওয়া, প্রায় অর্থহীনভাবে হেসে উঠে মায়া বলল, 'আচ্ছা, কেন ছুটি মিলুম একমাস, কই কিছু জিজ্ঞাসা---আমার সর্বশরীর কাঁপছিল, অবশ্য ও প্রথমে আঙুলগুলিই দেখে থাকবে। আমার চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে আমার কীর্তিহীন শরীর নতজানু হয়ে ওর কোলের উপর শৃঙ্খলিত হাতদুটি রাখল, রেখে বলল, 'এই দশটা আঙুল দ্যাখো। দ্যাখো, আমার দু-হাতের আঙুল একরকম নয়। ভীষণ গ্ণ ও লোমহীন এই শাদা আঙুলগুলো, দ্যাখো।

'কী হল আপনার? মায়া তখনো বলছিল।

টেবিলের উপর হাতদুটি ফেলে রেখে, ধোঁয়ার মধ্য থেকে ওর সামনে পরিস্ফুট হতে হতে বললুম, 'ঘাতকের এইরকম হয়।' কিন্তু বলার জন্যে এবারেও আমাকে ওষ্ঠ ব্যবহার করতে হল না। ওর ভ্রূ-তে ভ্রূ আটকে আমি ওর দিকে চাইলুম।

ঠোঁট ফাঁক করে আমি অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে রইলুম। স্মৃতি এসে ওষ্ঠ ও অধরে আশ্রয় নিলে ক্রমে রঞ্জিত হয়ে উঠতে লাগল ওর ঠোঁটদুটি, আমার হাঁ - করা মুখ থেকে নির্গত হয়ে এক বোবাকালা ওর অভ্যন্তরস্থ বোবাকে স্পর্শ করল, সহস্রচক্ষু প্রস্থানভূমির অন্ধকার থেকে তুলে এনে, সে পাছে লীন হয়ে যায়, এতদিনের সকল কথাবার্তা, তার প্রতিটি অক্ষর ও তাদেরর গোপন পরিচয় দেখাতে লাগল। এতদিনের কথাবার্তা নেরছ্য থেকে উঠে এসে কোলাহল করে ঘিরে ধরেছে ওকে, হাত ধরে টানাটানি করছে বারে - বারে, যেন -বা মেঘের মতো একঝাঁক ভ্রমর অগ্রসর হচ্ছে, তার দিকে...

কাপড় গয়না বাজিয়ে আচম্বিতে উঠে দাঁড়াল মায়া। সম্পূর্ণ পাগলাটে গলায় সংক্ষেপে বলল, 'চলি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এতদিন দেখা হল, এক আর জিজ্ঞেস করা চলেই না, আপনার নামটা কিন্তু আমি কোনোদিন জানি না।'

আমি হাত তুললুম দাঁড়াও।

মায়া যাক, একটা সমস্যা গেল।

আমি দাঁড়াও।

মায়া যাই তাহলে?

এইসময় কালো - ইস্পাতে - ঢাকা একটা পুলিশ - ভ্যান রেস্তরাঁর সামনে পৌঁছে দাণ জোরে ব্রেক কষল। ককিয়ে উঠে রাস্তার উপর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল গাড়িটা, সমস্ত কেবিন কেঁপে উঠল তারপর। একেবারে তৎক্ষণাৎ ঝনঝন করে রেস্তরাঁর কাচের দরজার বিশাল পাল্লাদুটি খুলে গেল, শুও - এর শব্দ তুলে হেঁটে এসে একজন আগন্তুক অতিরিক্ত আলো ফেলে রেস্তরাঁর ভিতরঢুক। হলের মাঝখানে পৌঁছে পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

গান থেমে গেল।

'তোমার ডাকনাম কী?' সেই কাঁপুনি ও ঝনৎকারের মধ্যে আমি এই প্রথম আমার এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম, যে - স্বরে এর আগে আমি কখনো কথা বলিনি।

কিছুকাল পরে মায়া ঘুরে দাঁড়াল টেবিলের কোনাটুকু ধরে, কেবিনের ঢাকা আলোর নিচে টেবিলের - উপর - পড়ে - থাকা অস্ত্রহীন নিপাতিত ও নগ্ন আমার হাতদুটি নেড়ে দেখল, পরে বাঁ-দিক উলটে অন্ধকার থেকে ডান গাল ফেরাল। আসল মুঠিতে কানের পিছনে কেশরাশ তুলে, ধরে রেখে, ক্ষণকাল ধরে তার ডান গালের গভীর ক্ষতচিহ্ দেখাল।

দর্পণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজের হাসি স্বচক্ষে দেখে মাতাল যেমন করে হাসে, আমি সেইরকম হাসলুম

সে বলল এ আমি জানতাম।

আমি তুমি বিধবা হয়েছ আমাকে বল নি কেন?

সে জানি যে তুমিই আমাকে বিধবা করেছ!

জ্ব১৯৬০৵

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com